চতুর্থ অধ্যায়

বাংলা ছোটগল্পে শ্রীরামকৃষ্ণ

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলা ছোটগল্পে শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মীয় জগতের পুরোধা হলেও উনিশ শতকের সমাজে ছিলেন একজন আলোকিত ব্যক্তিত্ব। স্বাভাবিকভাবেই তিনি যেমন ধর্মীয় ও সমাজকে আলোড়িত করতে পেরেছিলেন, তেমনি সমাজও তাঁর প্রভাবকে স্বীকার করে নিয়েছিল। সাহিত্য যেহেতু সমাজের প্রতিফলন, তাই সাহিত্যেও শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখা গেল বিভিন্নভাবে। বাংলা সাহিত্যের ধারায় উপন্যাস, কাব্য, নাটকের মতো ছোটগল্পের ইতিহাসেও রামকৃষ্ণ এলেন ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি নিয়ে—কখনো প্রত্যক্ষ কখনোবা পরোক্ষভাবে।

কথাসাহিত্যে ছোটগল্পকে বলা হয় সময়ের ফসল, মুহূর্তের সৌধ, জীবনজিজ্ঞাসার নবদিগন্ত, যুগযন্ত্রণার অনন্য সৃষ্টি। তাতে সময়ের অনুবাদ নিবিড় হয়ে ওঠে। সেদিক থেকে তার পরিসর বিস্তৃত। ভূদেব চৌধুরী বেশ সুন্দর বলেছেন, "ছোটগল্প-শিল্পের চূড়ান্ত সফলতা জীবনের বিন্দু-বিম্বনে নয়, বিন্দুর সম্পূর্ণ জীবন্মুক্তিতে।"[১] সুতরাং ছোটগল্পের আবেদন সাহিত্যের অন্যান্য শাখাগুলির তুলনায় অনেক বেশি আধুনিক ও প্রবল। সংবেদনশীল এই ধারাটিতে তাই সূক্ষ্মভাবে চিত্রিত হয় সমাজ ও আধুনিকতা। এহেন একটি ধারায় আধ্যাত্মিক পুরুষ রামকৃষ্ণের পরিচিতির বিভিন্নতা যেমন একদিকে প্রকাশিত হয়, তেমনি সমকালীন সমাজে তাঁর গ্রহণ ও বর্জনের বিষয়টিও নজরে আসে।

যেহেতু শ্রীরামকৃষ্ণ আধ্যাত্মিক জগতের অন্যতম ব্যক্তিত্ব, তাই গল্পে তাঁর সেই পরিচিতি আসাটাই স্বাভাবিক। তবে তা এসেছে কখনো প্রত্যক্ষভাবে কখনোবা পরোক্ষভাবে। প্রত্যক্ষভাবে তিনি নিজে যেমন এসেছেন চরিত্র হয়ে, তেমনি আপন চারিত্রিক প্রতিষ্ঠা আপনাতেই সহজলভ্য হয়ে উঠেছে। আবার অন্যদিকে তাঁর শিষ্যমন্ডলীর অনেকেই বিশেষত স্বামী বিবেকানন্দ, পত্নী শ্রীমা সারদা দেবী ছোটগল্পে এসে পড়েছেন। পরোক্ষ চিত্রে ধরা পড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাদর্শ বা

শ্রীরামকৃষ্ণসহ অন্যান্য শিষ্যদের চারিত্রিক ছায়াপাত। শ্রীরামকৃষ্ণের নাম বা ছবি ব্যবহারের চিত্রও লক্ষ করা যায়। তবে বিশ শতকের দোরগোড়ায় বাংলা সাহিত্যের যে ধারাটির জন্ম হল এবং ক্রমশ বিকশিত হল, তাতে শ্রীরামকৃষ্ণ-সংস্পর্শ সেভাবে প্রকাশ পেল না। বরং পরোক্ষ প্রভাব তথা শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাদর্শ ও চারিত্রিক ছায়াপাতের প্রভাবই অতিমাত্রায় সক্রিয় রইল।

প্রত্যক্ষ প্রভাব

যেসব গল্পে শ্রীরামকৃষ্ণ সরাসরি এসেছেন সেগুলি নিয়ে প্রথমে আলোচনা করা যেতে পারে। একালের একজন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৬ –) তাঁর সাহিত্যের ভিত্তিভূমি করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনকে। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর সাহিত্য শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্য হয়ে উঠেছে। তাঁর রচিত বেশ কয়েকটি গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণ-মা সারদা ও বিবেকানন্দ সম্পর্কিত ঘটনা গল্পের মতো করে কথাসাহিত্যের আদলে রচিত হয়েছে, সেগুলি হল- 'ষড়রত্ন' (১৪২২ বঙ্গাব্দ), 'মহামানবের সাগরতীরে' (২০১২), 'বলো বলো সুরধুনী' (১৪০৯ বঙ্গাব্দ), 'শ্রীচরণকমলে' (১৩৯৯ বঙ্গাব্দ), 'আজ আছি কাল নেই' (১৪১১ বঙ্গাব্দ), 'জগৎচন্দ্র হার' (১৪০৮ বঙ্গাব্দ), 'শিবের শক্তি জীবের জননী' (১৪১১ বঙ্গাব্দ) এবং 'শ্রীরামকৃষ্ণ মেল' (১৪০৬ বঙ্গাব্দ)। তবে এর বেশিরভাগই প্রবন্ধ রূপ ধারণ করে। 'ফাঁস' (১৪০৫ বঙ্গাব্দ) নামক গল্প সংকলনের কয়েকটি গল্পেও শ্রীরামকৃষ্ণের পরোক্ষ প্রভাব আছে।

তাঁর রচিত গ্রন্থ 'ষড়রত্ন' (১৪২২ বঙ্গাব্দ)-তে ছয়জন মহান ব্যক্তির জীবন কাহিনি রয়েছে- বামদেব, ওঁঙ্কারনাথ, শ্রীচৈতন্যদেব, রানী রাসমণি, শ্রীরামকৃষ্ণ এবং মা সারদা। শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়ে তিনটি এবং মা সারদা বিষয়ে দুটি রচনা আছে।

'দক্ষিণেশ্বরে এলেন শ্রীরামকৃষ্ণ তখন তিনি গদাধর' রচনায় শ্রীরামকৃষ্ণ যখন দক্ষিণেশ্বরে এলেন তখনো তিনি প্রতিষ্ঠা পাননি। তবে ক্রমশ সেই প্রতিষ্ঠা পর্বের দিকে ক্রমোত্তরণ ঘটেছে গদাধরের। সাহিত্যের আঙ্গিকে লেখকের কলমে এই উত্তরণটিই গদাধরের অন্তর্লোককে প্রকাশ

করে। কারণ রামকুমারের কোনো স্বপ্ন ছিল না। কিন্তু গদাধরের ছিল। অবতাররূপী গদাধর কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎবাণী করলেও গদাধরের ইহলৌকিক জীবন বেশি প্রাধান্য পেয়েছে।

গদাধর শ্রীরামকৃষ্ণ রূপে যা যা করেছিলেন অর্থাৎ পরবর্তী পরলোক গমন পর্যন্ত তার ক্রিয়াকর্মের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। গল্পের ধরন দেখে মাঝে মধ্যে মনে হয় শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক জীবনী রচনা ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য লেখকের ছিলনা। সেদিক থেকে গল্পের কিছু উপাদান তিনি গ্রহণ করেছেন। যেমন ছোট ছোট বাক্য। কথার ছলে বলা। গল্পের মতো করে বলা। এতদসত্ত্বেও রচনাটি নিছক রচনা ছাড়া আর কিছু হয়ে ওঠেনি। এর মূল কারণ ছোটগল্পের বিষয়বস্তুতে থাকে একটি শক্ত কাহিনি যা আদি-মধ্য-অন্ত্যে বিভক্ত। যার একটি মূল দিক থাকবে। কিন্তু এ রচনায় তা নেই। স্বাভাবিকভাবেই গল্পের সংজ্ঞা থেকে বেরিয়ে গল্পের মতো করে বলার দিকটিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন লেখক। অন্যদিকে আধ্যাত্মিক জগতের গুরু রূপে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব ছোটগল্পের বাস্তবতাকে অস্বীকার যেমন করেছে, তেমনি ভবিষ্যতের কথা বর্তমানের উক্তিতে প্রতিষ্ঠা দিয়ে মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণকে অস্বীকার করা হয়েছে। সেকারণেই রচনাটি সার্থক ছোটগল্পে পরিণত হয়নি।

পরের রচনা 'ঈশ্বরচন্দ্রের আবাসে শ্রীরামকৃষ্ণ'। কথামৃত থেকে সংগ্রহ করা হয় এই অংশটি নিজের মতো করে লিখেছেন সঞ্জীবচন্দ্র। ঈশ্বরচন্দ্রের বাড়িতে যাওয়ার পূর্বমূহূর্ত থেকে তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার বর্ণনা তিনি দিয়েছেন। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণ একজন মানুষ, কোন অবতার ভাবনা নেই। তবে ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে কথপোকথনে ফুটে উঠে শ্রীরামকৃষ্ণের মহত্ত্ব। এখানে তিনি মহাজীবন। বিদ্যাসাগরের বর্ণনা দিতে গিয়ে সংক্ষিপ্ত ক্রিয়াহীন বাক্য ব্যবহার করেছেন :

> "বিদ্যাসাগর মশাইয়ের বয়স তখন বাষট্টি কি তেষট্টি। ঠাকুরের চেয়ে ষোলো সতেরো বছরের বড়ো। সেই পরিচিত বেশ। থান কাপড়, পায়ে চটি জুতো, গায়ে হাত কাটা ফ্লানেলের জামা। মাথার চারপাশে ওড়িশাবাসীদের মতো কামান। সব দাঁতই বাঁধান। উন্নত ললাট, সামান্য খর্বাকৃতি, গলায় উপবীত।"[২]

আবার গল্পের শেষটিও চমৎকার বর্ণিত হয়েছে :

> "একটি লণ্ঠন হাতে বাগানের পথে ঈশ্বরচন্দ্র গেটের দিকে চলেছেন। এই আলো অনুসরণ করে ভক্তদের হাত ধরে ঠাকুর চলেছেন। গাড়ীতে ওঠার আগে বিদ্যাসাগর মহাশয় ও সকলে প্রণাম করলেন। বেশ রাত, অন্ধকার। কালো গাড়িটি, মায়াবী গাড়িটি অতীতের অন্ধকারে দূর থেকে দূরে অপসৃয়মান। ১৮৮২ সাল, ৫ আগষ্ট, শনিবার।"[৩]

বস্তুত গল্পের পরিসরে এটি সুন্দর নিদর্শন হয়ে উঠেছে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের ঘটনা অনুসরনণ প্রত্যক্ষজাত ছোটগল্প হিসেবে। বাস্তবের রক্তমাংসের চরিত্র হয়েও মহান ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। সেদিক থেকে সমকালীন সময়ের বাস্তবতাকে লেখক সুনিপুণভাবে গ্রহণ করেছেন এই গল্পে।

তৃতীয় রচনা 'ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কি শেষ আছে!!' এখানেও শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবান। ১৮৮৩-র অক্টোবর মাসের কোনো এক রবিবারে অবিনাশচন্দ্র সমাধিস্থ শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি তুলছেন, তার বর্ণনা দিয়েছেন প্রথমে। পরে পরে যুক্ত করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও জীবনের নানা ঘটনা। লেখকের বর্ণনাতেও অবতাররূপী শ্রীরামকৃষ্ণের পরিচয় পাওয়া যায় :

> "শ্রীরামকৃষ্ণ বহুবার বলেছেন, গুরু কর্তা, বাবা, অবতার ইত্যাদি অলংকার আমার অসহ্য মনে হয়। আমি স্বেচ্ছায় সাজতে চাই না। যদি হঠাৎ কিছু প্রকাশ হয়ে পড়ে, আর কেউ যদি দেখে ফেলে থাকেন, আমার কিছু করার নেই। আমি অসহায়। বেরিয়ে আসে। কেন বেরোয়? তিনি জানেন। আমি অসম্ভব লৌকিক। মাটি ঘেঁষা লোক। যাদের কোন গর্ব নেই, গৌরব নেই। আমি তাদের। আমি কাঁদতে জানি। আর জানি, ঈশ্বরের কাছে আমার টিকি বাঁধা। আমার ধর্মের প্রথম এবং শেষ কথা- সৎ হও।"[৪]

বলা চলে গল্পের উত্তরণ ঠিক এখানেই। ইতিহাসকে অস্বীকার করে মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনোত্তর জীবন তাই ভগবানের। গল্পটিও সার্থক ছোটগল্পে পরিণত হয়েছে।

মা সারদা সম্পর্কিত পরবর্তী দুটি রচনা 'মা সারদা' ও 'রাজ রাজেশ্বরী সারদা'। প্রথমটি নিছকই একটি রচনা, ছোটগল্প নয়। কারণ ভবিষ্যতের আঙ্গিকে শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন এসেছেন, তেমনই শ্রীমা সারদা দেবীর গুণাবলি বর্ণনা করেছেন খণ্ড খণ্ড কাহিনি বা বাক্যের মধ্যে দিয়ে। স্বামীজী তাঁকে কী চোখে দেখতেন, ভগিনী নিবেদিতার মাতৃদর্শন কীরূপ ছিল কিংবা অন্যান্য ভক্তদের কাছে শ্রীমা কেমন ছিলেন সেই রূপের চিত্র বারে বারে চিত্রিত হয়েছে। স্বামীজীর কথায় মা সারদাকে চেনা খুব শক্ত। সেই মা সারদা যে জগজ্জননীর এক রূপ, সেই কথাই সারদা দেবীর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা অবলম্বনে একটি তথ্যচিত্র পরিবেশন করা হয়েছে এই রচনায়। রচনা এ কারণেই বলা হল কারণ এতে তথ্যকে কথাসাহিত্যের আদলে রেখে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা এসেছে। বরং 'রাজ রাজেশ্বরী সারদা' রচনাটিতে তবু একটি নির্দিষ্ট গল্প আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের সারদা পূজাকে কেন্দ্র করে সারদা দেবীর রাজ রাজেশ্বরী রূপকে চিত্রিত করা হয়েছে। তবে এখানে সারদা কেবল উপলক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার কথায় মুখ্য।

যেহেতু সাধনা মুখ্য, তাই মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাধান্য বেশি। একটি নির্দিষ্ট ঘটনাকে কেন্দ্র করে লেখক সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই গল্পটি লিখলেন যা ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করেনি। গল্পের নামকরণে মা সারদা থাকলেও গল্পের প্রধান চরিত্র শ্রীরামকৃষ্ণ—সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ। গল্পটির মধ্যে দিয়ে গল্পকার যেমন মানব জীবনে সাধনাকে গুরুত্ব দিলেন, তেমনি নারীদেবীকে প্রতিষ্ঠা করলেন। সেদিক থেকে বর্তমান সময় ও সমাজে এই ঐতিহাসিক গল্পটির গুরুত্ব অপরিসীম।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অপর একটি গ্রন্থ 'মহামানবের সাগরতীরে' (২০১২)। গ্রন্থটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-রাসমণি-নিবেদিতা-বিবেকানন্দ বিষয়ক দশটি রচনা সংযুক্ত হয়েছে। প্রথম রচনা 'শিষ্য পরিবৃত শ্রীরামকৃষ্ণ'। এতে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখা যায় তিনি যেন অপেক্ষা করছেন তাঁর সকল গৃহী ও সন্ন্যাসী ভক্তদের জন্য। মূলত সন্ন্যাসী শিষ্যদের আগমনের প্রেক্ষিতটি লেখক কথাসাহিত্যের আদলে নির্মাণ করেছেন। তবে তথ্য অনুযায়ী অতিরিক্ত সময়কালের নির্দেশ রচনাটিকে গল্প হতে বাধা দিয়েছে। রচনাটি কেবল ইতিহাসের ঘটনাচিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পরের রচনা 'শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবানের বাবা' তত্ত্বকথার রচনামাত্র। শ্রীরামকৃষ্ণ কেন ভগবানেরও উপরে, সে কথাই এখানে বিবৃত হয়েছে। পরের 'কল্পতরু হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ : ১ জানুয়ারি ১৮৮৬' রচনাটিও একটি দর্শনমূলক প্রবন্ধ। 'সর্বস্বরূপে সর্বেশে সর্বশক্তি সমন্বিতে'-ও বিষয়ক প্রবন্ধ। বরং পরের 'রানী রাসমণি' রচনাটি একটি জীবনী গল্পরূপে উপস্থাপিত হয়েছে। রচনাটি জীবনীমূলক প্রবন্ধ হয়ে একপাশে থেকে যেত, যদি না এর আবেদনটি হত কথাসাহিত্যের মতো করে। যেমন :

> "রানী কি দেখছেন! অর্থবিত্তের অভাব নেই। প্রচুর সম্পত্তি। পাইক, বরকন্দাজ, গোমস্তা, ম্যানেজার চারিদিকে গিজগিজ করছে। ..... রাসমণি এলেন প্রাতঃকালে। মাহিষ্যবংশে, পিতা হরেকৃষ্ণ দাস। সেকালের উন্নাসিকতায় হারু ঘরামী। হারু সকলের বাড়ি তৈরি করে দেন, কিন্তু নিজে থাকেন জীর্ণ কুটিরে। দরিদ্র মানুষ। সামান্য চাষবাস আছে। কোনওরকমে সংসার চলে যায়। হারুর একটাই প্লাস পয়েন্ট—লেখাপড়া কিছু জানতেন।"[৫]

কিংবা "মা যখন বেঁচে ছিলেন, যা কেউ দেখতে পায়না কোনদিন, রাসমণি দেখেছিলেন- ডুমুরের ফুল। এটিকে বলা যেতে পারে এক অবাক কান্ড।"[৬] ইত্যাদি।

রচনাটিতে শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন ইতিহাসের নিয়ম মেনেই। দক্ষিণেশ্বরের বেশকারের ভূমিকায় গদাধর চট্টোপাধ্যায়। তবে পরবর্তীকালে গোবিন্দজির পা ভাঙা বা গদাধরের পাগলামি

দেখে রানীর চোখে তিনি অবতার হিসেবে প্রতিপন্ন হয়েছিলেন, সে দৃশ্যও এখানে লক্ষ করা যায়। রচনায় সাল তারিখ ও বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন বলে তা অনেক বেশি ভার বলে মনে হয়েছে, যা ছোটগল্পের ক্ষেত্রে সাজুয্যপূর্ণ নয়।

'স্বামীজি কেন বলেছিলেন, মাকে তোমরা চেনোনি, চিনবেও না কোনদিন?' রচনায় শ্রীরামকৃষ্ণের অনুপ্রবেশ মা সারদার কথা বলতে গিয়ে। গল্প বলেছেন লেখক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় :

> "ঠাকুর একদিন দুপুরবেলায় পঞ্চবটীতে বসে আছেন। গঙ্গার দিকে মুখ করে। সামনে ঝকঝকে গঙ্গা। পঞ্চবটীতে সূর্যের সঙ্গে অজস্র পাতার খেলা চলেছে ছায়া নিয়ে। নির্জন নিরালা। মন্দিরেও দেবতারা ভোগারতির পর বিশ্রাম নিচ্ছেন। অলস দ্বিপ্রহর। ঠাকুর ডানদিকে মখ ঘুরিয়ে চমকে উঠলেন। ঝাউতলার দিক থেকে অপরূপা সুন্দরী এক নারী মৃদু চলনে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছেন। গাছের ডালপালা আন্দোলিত করে বড়-বড় হনুমান নেমে এসে তাঁর পায়ে পায়ে প্রণাম করছে। ঠাকুর চমকে উঠলেন।–এ যে সীতা !"[৭]

স্বাভাবিকভাবেই শ্রীরামকৃষ্ণ মা সারদা কে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিষ্ঠান দিয়ে যাচ্ছেন। সেদিক থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাদেবীরও গুরু : "দুঃখের পাঠশালায় সারদার পাঠ শুরু হল। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ। জীবন তোমাকে পাট পাট করবে। কিন্তু তুমি থাকবে অবিচল।"[৮] বস্তুত মা সারদার শক্তির কথা বর্ণিত হলেও তার পেছনে যে শ্রীরামকৃষ্ণের পরিচালনা আছে তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন লেখক। শ্রীরামকৃষ্ণ এখানে মহামানব এবং একইসঙ্গে মহামানবীসহ অনেকের পরিচালকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। তবে এই গ্রন্থেও অন্যান্য রচনাগুলির তুলনায় এই গল্পটি অনেকখানি ছোটগল্প হওয়ার দাবি রাখে।

গ্রন্থের শেষ রচনা 'কিছু লৌকিক, কিছু অলৌকিক'-এ শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের বেশকিছু অলৌকিক ঘটনার কথা আছে। তবে সেগুলি প্রচলিত জীবনী গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করেছেন লেখক। এমনকী, রচনায় উপনিষদের ব্যাখ্যা টেনে যুক্তি দিয়ে তা বিশ্লেষণ করেছেন। গ্রন্থে আছে, শ্রীরামকৃষ্ণের মা চন্দ্রাদেবী ও পিতা ক্ষুদিরামের বিভিন্ন স্বপ্নদর্শনের কথা, স্বামী বিবেকানন্দ, লাটু মহারাজ, রাখাল মহারাজ প্রমুখের জীবনের অলৌকিক ঘটনার কথা, ভূত দর্শনের কথা। তবে তা ছোটগল্পের আঙ্গিকে রহস্যে, রোমাঞ্চে ভরা নয়—নিখাদ তথ্য দিয়ে ভরা টুকরো টুকরো গল্প। এই রচনাটিকেও গল্পের আখ্যা দেওয়া যায় না। কারণ এখানে গল্পের বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে অলৌকিক ঘটনার কথা

বলার সঙ্গে সঙ্গে। এখানে তার যুক্তিও দেওয়া হয়েছে বিজ্ঞান ও উপনিষদকে ভিত্তি করে। আবার অন্যদিকে শ্রীরামকৃষ্ণের উপস্থিতি ক্রমশ সরে গেছে অন্যান্য শিষ্যদের প্রসঙ্গ আনতে গিয়ে।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের অপর একটি গ্রন্থ 'শ্রীরামকৃষ্ণ মেল' (১৪০৬ বঙ্গাব্দ)। এতে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দসহ মোট আটটি রচনা আছে। প্রথম রচনার নামই 'শ্রীরামকৃষ্ণ মেল'। ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ মথুরাবাবুর সঙ্গে কাশী গিয়েছিলেন তীর্থদর্শনের উদ্দেশ্যে। ইতিহাসের সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে লেখক সঞ্জীব ছোটগল্পের আঙ্গিকে 'শ্রীরামকৃষ্ণ মেল' লিখলেন। গল্পের শুরুটি বেশ সুন্দর :

> "জানুয়ারি মাস। কলকাতায় তখন খুব শীত পড়ত। তখন মানে ১৮৬৮ সাল। কথায় আছে আধা মাঘে কম্বল কাঁধে। তা মাঘ মাসের সাত আট তারিখ। শীত যাই যাই করলেও বেশ কামড় আছে। পশ্চিমে প্রবাহিণী গঙ্গা। উত্তুরে বাতাসে প্রথম সকালে বেশ একটা হিম হিম ভাব। মোলাস্কিনের চাদরটি গায়ে দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটীতে হাসি হাসি মুখে পায়চারি করছেন। ... ..."[৯]

গল্পের ঘটনা ট্রেনে যাওয়া এবং তৎপরবর্তী বুভুক্ষু মানুষদের খাওয়ানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ। তবে অসাধারণ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবময় পরিবেশ তৈরি করে গল্পকার ইতিহাসের ঘটনাকে মুখরিত করে তুলেছেন। প্রতিটি চরিত্রও বাস্তব হয়ে উঠেছে তাঁদের কথাবার্তা ও আচরণের মধ্য দিয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণসহ মথুরামোহন, হৃদয় চরিত্র এখানে সার্থক হয়ে উঠেছে ইতিহাসে চরিত্রগুলির অনুসরণে। গল্প বলার ধরনটি সরল, সুন্দর ও স্পষ্ট। গল্পের ব্যঞ্জনা শ্রীরামকৃষ্ণের সত্যিকারের পরিচিতির দিকে ইঙ্গিত করে :

> "সূর্য নামল পশ্চিমে। দূর আকাশে ত্রিকুটের ছবি আরো গাঢ় হল। আকাশের রঙ হয়ে এল ধূসর নীল। গ্রামের মানুষ পরিতৃপ্ত হয়ে ফিরে গেল গ্রামে। কেউই জবাব পায়নি তাদের প্রশ্নের- কে বটে তু! এক বালক বলেছিল, ভগবান বটে! হতে পারে! গল্পে আছে, জীবের দুঃখে বৈকুণ্ঠের ভগবান মানুষের ভগবান হয়ে নেমে আসেন!"[১০]

গল্পটিতে শ্রীরামকৃষ্ণকে অঙ্কন করেছেন মাটির মানুষ হিসেবে। তাঁর শিবজ্ঞানে জীবসেবার ভাবটি এখানে সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে। অলৌকিকতাকে বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় না দিয়ে লেখক শ্রীরামকৃষ্ণের জীবসত্তাকে তুলে ধরেছেন এই গল্পে। সেদিক থেকে গল্পটি সার্থক হয়ে উঠতে পেরেছে। নামকরণটিও সার্থক হয়ে উঠেছে। গল্পের শেষে তারই ব্যাখ্যা :

> "সাইডিং থেকে লাইনে এলো চারখানা কোচ, জুড়ে গেছে ইঞ্জিন। গার্ড সাহেব বাজাও বাঁশি, নাড়াও পতাকা। ঐ দেখ, যায় চলে 'রামকৃষ্ণ মেল' ইতিহাসের লাইন ধরে।"[১১]

পরের গল্প 'শ্রীরামকৃষ্ণের পানসি'। এটি প্রথম গল্পের অনুসারী। এই অংশে আছে কাশীর মণিকর্ণিকা নামক শ্মশানঘাটে ভ্রমণ ও ত্রৈলঙ্গস্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎপ্রসঙ্গ। গল্পে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ' থেকে উদ্ধৃতি নেওয়া হয়েছে। এই উদ্ধৃতি দু'বার করে নেওয়াতে পাঠকের কাছে তা দ্বিরুক্তির মতো হলেও সাহিত্যে তা এতটুকু কষ্টকর বলে মনে হয়নি। শ্রীরামকৃষ্ণের পরিচিতি অতি সাধারণ মানুষ হিসেবেই। তবে ইতিহাসের প্রতিচ্ছবি বলে এবং ধর্মীয় জগতের মান্য মহামানবের স্বীকৃতি দিয়েছেন বলে লেখক ইতিহাসের সামান্যতম পরিবর্তন বা সাহিত্যিক কল্পনার আশ্রয় নেননি। কেবল পরিবেশ ও সমকালীন সময়কে তুলে ধরতে যতটুকু কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন, সেইটুকুই। একারণে মূল ঘটনা অবিকৃত অবস্থায় থেকেছে। তৃতীয় গল্প 'শ্রীরামকৃষ্ণের মণিকর্ণিকা'-য় মণিকর্ণিকায় মহাশ্মশানের বর্ণনা দিতে গিয়ে গল্পকারের সাহিত্যিক প্রতিভা অসাধারণ ভঙ্গিমায় ব্যক্ত হয়েছে :

> "মণিকর্ণিকার শ্মশানে একজোড়া চিতা লকলক করে জ্বলছে। অগ্নিজিহ্বা জীবশরীর লেহন করছে। ... ... তরতরে জাহ্নবী ভেসে চলেছে সাগরে। দগ্ধনীল আকাশে পায়রার ঝাঁক। ভাসমান পানসীর গাঢ় ছায়া। কত জাতির স্ত্রী পুরুষের স্থান। চিতার ধূম দীপ্ত আকাশে ধূসর জটার মতো উদ্গীর্ণ। স্বজন হারানোর রোদন। শিশুদের হর্ষ-চিৎকার।"[১২]

তবে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গী মথুরামোহন মনে করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। অবশ্য তা গল্পের কোনো ব্যাঘাত ঘটায় না। গল্পের চরিত্রগুলি কেউ কাউকে অবতার বললে তাতে গল্পের দোষ হয়ে যায় না, বরং চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

চতুর্থ গল্প 'শ্রীরামকৃষ্ণের কালীপূজা'। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণীর পুরোহিত ছিলেন। গল্পে প্রথম দিকে গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের পাগলামির কথা বর্ণিত হলেও লেখক শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতারত্বে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি পাঠকের কাছে প্রশ্ন রেখে তার উত্তর দিয়েছেন পরে পরে :

> "প্রশ্ন এই, যিনি অবতার , সাধারণ মানুষের মতো তাঁর এত সাধন-ভজন, এত অনুসন্ধান কেন? এর উত্তর পাওয়া যাবে পরে। তবে এইটুকু বলা যায়, শ্রীরাম, শ্রীচৈতন্য আদি সব অবতারকেই মানুষের মহৎ ভূমিকা পালন করতে হয়েছে, মানুষের পরিণতি বরণ করে নিতে হয়েছে।"[১৩]

বারেবারে লেখক সেই অবতারত্বকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। 'অদ্ভুত পুজারী'র অদ্ভুত পূজাকে লেখক বলেছেন, "অবতারের পূজা, এ শধু প্রথা নয়, প্রমাণ।"[১৪] কিংবা কখনো বলেছেন, "অবতারেরর সাধনা। সে বড় বিচিত্র! সাধারণ সাধকের দুঃসাধ্য।"[১৫]

এইসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের বেশ কিছু অলৌকিক ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন নিজের ডান পা নরেনের শরীরে রেখে অলৌকিক সাধন ঘটিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। উদ্ধৃতি এনেছেন লীলাপ্রসঙ্গ থেকে। আবার লাল ফুলের গাছে সাদা ফুল ফোটানোর ঘটনাও আছে। একইসঙ্গে মথুরামোহনের অলৌকিক দর্শনের কথা বর্ণিত হয়েছে :

> "বাবা, তুমি বেড়াচ্ছো আর আমি স্পষ্ট দেখলুম, যখন এদিকে এগিয়ে আসছ, দেখছি তুমি নও, আমার ঐ মন্দিরের মা। আর যেই পেছন ফিরে ওদিকে যাচ্ছ, দেখছি কি যে সাক্ষাৎ মহাদেব! ..."[১৬]

গল্পে অবতারকে স্বীকৃতি দিয়ে চরিত্রের মধ্যে মাধুর্য আনা যায়, আবার অন্য দিক দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রামাণ্য জীবনীতে এইসব অলৌকিক ঘটনার কথাও উল্লেখ আছে, সেক্ষেত্রে সাহিত্যের রস সামান্যতমও ক্ষুণ্ণ হয়নি। কিন্তু যখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মুখ দিয়ে ভবিষ্যতের বিষয়, যা সত্যি সত্যিই ভবিষ্যতে ঘটবে- জীবনী ঘাঁটলে দেখা যায়, তখন মনে হয় চরিত্রটির অবাস্তবতার কথা। ঠাকুরের মুখে লেখক এইভাবে সেই ভবিষ্যৎবাণী করেছেন :

> " মা, আমি তোমাকে দেখব। নিজে না দেখলে, পরে নরেন এসে যখন উগ্র প্রশ্ন করবে, আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করেছেন, তখন আমি কেমন করে বুক ঠুকে উত্তর দোবো, হ্যাঁ করেছি, মাইরি বলছি করেছি, এই ঠিক যেমন এখন তোকে দেখছি। কেমন করে তখন আমি বলব, তিনটান এক করতে পারলেই তাঁর দর্শন পাওয়া যায়।"[১৭]

বলা বাহুল্য, এখানেই গল্পটি সার্থক ছোটগল্প হয়ে উঠতে পারেনি। এছাড়াও এতে লীলাপ্রসঙ্গ থেকে বেশ দীর্ঘ উদ্ধৃতি গৃহীত হয়েছে যা গল্পের পক্ষে সুবিধাজনক নয়।

তবে এই রচনার বিষয়বস্তুতে শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের যত বিখ্যাত কালীপুজো ঘটেছে, শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক- প্রায় সবকটিই লেখক গ্রহণ করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে সারদাদেবীকে দেবী জ্ঞানে পূজা করার কথাও আছে। এই রচনায় শ্রীরামকৃষ্ণকে যে দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়েছে হুবহু একইভাবে একই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন 'আপনার পূজা আপনি করিলে, এ কেমন লীলা তব' রচনায়। এতেও শ্রীরামকৃষ্ণ যে অবতার তা প্রতি ছত্রে লক্ষ করা যায়। কথামৃত থেকে ৬ নভেম্বর, ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ঘটনাটিকে তুলে ধরেছেন এই রচনায়। এইসঙ্গেই ঐ পুণ্যস্থানে যেখানে উক্ত ঘটনা ঘটেছিল সেই শ্যামপুকুরের বাটিতে শতাব্দী অতিক্রান্ত হওয়ার পরের একটি ঘটনাকে যুক্ত করেছেন লেখক :

"শ্যামপুকুর বাটির দোতলার সেই স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজির পাঠ ছিল। উপচে পড়া ভক্তসমাগম। প্রসঙ্গ সমাপ্ত। ভক্তমন্ডলী বিদায় নিলেন। একেবারে নিরালা উঠোনে দাঁড়িয়ে দোতলার বারান্দায় শূন্যতার দিকে তাকিয়ে আছি। শেষ ঝাড়টি তখনো নেবেনি। পাশে দাঁড়িয়ে শ্রীম-র বংশধর, নীরব কর্মী গৌতম গুপ্ত।"[১৮]

বলাবাহুল্য, এভাবেই বর্তমানের কয়েকটি বাস্তব ঘটনা ও চরিত্রের সঙ্গে নিজেকেও সংযুক্ত করলেন লেখক।

পরবর্তী রচনা 'কে তুমি বিবেকানন্দ'। নামকরণে বিবেকানন্দের কথা থাকলেও ঘটনার মূল কারণটি শ্রীরামকৃষ্ণে নিহিত। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে বেছে নিচ্ছেন নিজের ভাবাদর্শ প্রচারের জন্য। তার কারণগুলি বলেছেন একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে। ঘটনার স্থান যদু মল্লিকের বাগানবাড়ি। এসবই ঐতিহাসিক সত্য। আর লেখকের কল্পনায় ফুটে উঠেছে ঘটনার প্রেক্ষাপট :

"ফুলে ফুলে ভরে আছে বাগান। ঠাকুর দাঁড়িয়ে আছেন সেই বাগানে। সবুজ ঘাসের ওপর। মৃদুমন্দ বইছে গঙ্গার বাতাস। চারপাশ বড় উৎফুল্ল। ঠাকুর যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, সামনেই যদু বাবুর বৈঠকখানা। বড়লোকের বসার ঘর যেমন হয়, সুসজ্জিত, সুরম্য অতি। কোণে কোণে নানা আকারের শ্বেতপাথরের টেবিল। সোফা-সেট।..."[১৯]

শুধু প্রথম সাক্ষাতের কথাই নয়, বেশকিছু সাক্ষাতের বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। শেষপর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের আন্তরিকতায় নরেন স্বামী বিবেকানন্দ হয়ে উঠছেন এবং তাঁর পরিচিত হয়ে উঠছে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবপ্রচারক হিসেবে—এখানেই কাহিনির পরিসমাপ্তি। সমগ্র গল্পে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাধান্যকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এখানে তিনি নরেনের গুরুদেব। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণকে সহজ ভাবে ও সহজ ভাষায় তুলে ধরেছেন লেখক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়।

গ্রন্থের শেষ রচনা 'শ্রীরামকৃষ্ণের কল্পতরু উৎসব'। গল্পটি শুরু হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের শ্যামপুকুর বাটি থেকে কাশীপুর উদ্যানে গমনের কাহিনি দিয়ে এবং শেষ হয়েছে ১ জানুয়ারি ১৮৮৬ তে শ্রীরামকৃষ্ণের কল্পতরু হওয়ার মধ্য দিয়ে। যেহেতু শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তলীলার কাহিনি এটি, তাই প্রামাণ্য জীবনীতে যেভাবে শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার স্বীকৃতি দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে, ঠিক সেইভাবেই লেখক সঞ্জীবচন্দ্রও শ্রীরামকৃষ্ণকে এঁকেছেন। গল্পের অনেকখানি 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত'-র সঙ্গে মেলে। তবে তিনি প্রামানণ্য গ্রন্থ হিসেবে এইসঙ্গে কথামৃতকেও সামনে রেখেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কল্পতরুরূপে প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর লেখক ঠাকুরের ভাবপ্রচারক হিসেবে স্বামী বিবেকানন্দ ও মা সারদার কথা এনে গল্পের সমাপ্তি ঘোষণা করেছেন। বলাবাহুল্য, এখানেও

লেখক অত্যন্ত সুচারুভাবে কথামৃত ও লীলাপ্রসঙ্গের শ্রীরামকৃষ্ণকে অবিকল অঙ্কন করেছেন। সেদিক থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত্রের উপস্থাপন বাস্তবের চরিত্রকে হুবুহু অনুসরণ করেই করা হয়েছে।

পরবর্তী গ্রন্থ 'জগৎচন্দ্র হার' (১৪০৮ বঙ্গাব্দ)-এ শ্রীরামকৃষ্ণ- সারদামণি বিষয়ক পাঁচটি রচনা আছে। এর মধ্যে 'কৃপা কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণ' রচনায় কথাসাহিত্যের উপাদান রয়েছে মাত্র। শুরু করেছেন শ্যামপুকুরের পরিবেশের বর্ণনা দিয়ে :

> "শ্যামপুকুর বাটীতে সকাল। কলকাতার শীতের সকাল যেমন হয়! ঘিঞ্জি এলাকা। গায়ে গায়ে বাড়ি। খোলা উনুনের ধোঁয়া ভারী বাতাসের সঙ্গে জড়িয়ে আচ্ছাদনের মতো ঝুলে আছে। ম্যাটম্যাটে রোদ। পল্লীর জেগে ওঠার মিলিত মিশ্রিত যাবতীয় শব্দ। বারান্দায় কাকের কর্কশ চিৎকার। শ্রীরামকৃষ্ণ বিছানায় উঠে বসেছেন।"[২০]

অসাধারণ প্রাকৃতিক পরিবেশের বর্ণনার মধ্য দিয়ে লেখক শ্রীরামকৃষ্ণে পৌঁছেছেন। সময়টা তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়। গলায় ক্ষত নিয়ে শ্যামপুকুর বাটীতে দৈহিক কষ্টের জীবনযাপন করেছেন তিনি। এরপর বাড়ি বদল করে গেলেন কাশীপুর বাগানবাড়িতে। সেখানের ঘটনা ১ জানুয়ারি, ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে। শ্রীরামকৃষ্ণের কল্পতরু হওয়ার দিন। লেখক বর্ণনা দিয়েছেন :

> "ঠাকুরও উঠে দাঁড়ালেন শয্যা ছেড়ে। পশ্চিমের ঝলমলে রোদ প্রজাপতির মতো ঘরে ভাসছে। আজ আমি অনেক সুস্থ। আজ পয়লা জানুআরি। ১৮৮৬। আমাকে সাজিয়ে দে। আজ আমি বাগানে নামবো। ছুটির দিন। ভক্তসমাগমে উদ্যান আজ প্রাণোচ্ছল। বসে আছেন সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ন্ত রোদে।"[২১]

বস্তুত এই রচনাটি গল্পের আঙ্গিকে ইতিহাসের ঘটনা আশ্রয়ে কল্পনার পরিবেশ তৈরি করে অসাধারণ একটি গল্পে পরিণত হয়েছে। তবে সঞ্জীবচন্দ্রের বিশেষত্ব এখানেই, তিনি ইতিহাসের তথ্যকে অবিকৃত রেখে কেবল পরিবেশকে অলৌকিক মায়ায় বেঁধে গল্পের বুনটটিকে রচনা করেছেন। সেদিক থেকে এটিও কথাসাহিত্যে অন্য মাত্রা লাভ করে। অন্যদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ তথাকথিত চারিত্রিক গঠন থেকে এতটুকুও সরে আসেনি। কথামৃত বা লীলাপ্রসঙ্গেও শ্রীরামকৃষ্ণ যেরূপ, এখানেও সেভাবেই এসেছেন, তবে আরো অনেকখানি রক্তমাংসের হয়ে উঠেছেন। ক্ষতের কারণে দৈহিক যন্ত্রণায় শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন একদিকে কাতর হয়েছেন, তেমনি আপন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য হাসিমুখে ভক্তমণ্ডলীর সঙ্গে গল্পও করেছেন, আনন্দও করেছেন।

বাংলা কথাসাহিত্যেও ছোটগল্প সংরূপটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব একদিকে যেমন সরাসরি এসেছেন, তেমনি গল্পের বিষয়বস্তুতে ভাব হয়ে কিংবা একটি বাণীর রূপ পেয়ে অথবা চিত্র বা কাহিনি সম্ভূত হয়ে যুক্ত হয়েছেন বিভিন্ন গল্পে। এরূপ গল্পগুলিও বাংলা সাহিত্যে অন্যতম স্থান দখল করে নিয়েছে। এইসব গল্পগুলি কথাসাহিত্যের বৈশিষ্ট্যগুলি পূর্ণ করেছে বলে সাহিত্যের মাপকাঠিতে তা উত্তীর্ণ হয়েছে সহজেই। আবার শ্রীরামকৃষ্ণদেব অস্পষ্ট বা কেবল নামাঙ্কিত হয়ে এলেও তাঁর প্রতিষ্ঠা হয়ে উঠেছে উজ্জ্বল। সুতরাং এই জাতীয় পরোক্ষ প্রভাবিত গল্পগুলিও শ্রীরামকৃষ্ণ অনুষঙ্গে অন্যতম। বর্তমান সময়ের চালচিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের অনুপ্রবেশ শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভাবকেই স্বীকার করে—সে অস্বীকার করাই হোক কিংবা শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করাই হোক না কেন। স্বাভাবিকভাবেই, সময়ের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব যেন সাহিত্যে সহজাত হয়ে উঠেছে ক্রমশ। বিখ্যাত ছোটগল্পকারদের গল্পরচনায় শ্রীরামকৃষ্ণের পরোক্ষ আগমন কথাসাহিত্যে শুধু নয়, সমাজে তার প্রতিফলনকে চিত্রিত করে। কারণ সমাজচিত্রের নির্যাস লেখকের কলমে সম্মান পেয়ে চিত্রায়িত হয় সাহিত্যে। শ্রীরামকৃষ্ণের চিত্রায়ণ তাই যুগোত্তর গ্রহণীয়তা স্বীকার করে।

পরোক্ষ প্রভাব

বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ছোটগল্পকারদের রচনায় তিনি এসেছেন পরোক্ষভাবে। সরলাবালা সরকার (১৮৭৫-১৯৬১), রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৬০), জ্যোতির্ময়ী দেবী (১৮৯৪-১৯৮৮), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০), বনফুল (১৮৯৯-১৯৭৯), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৬) , শিবরাম চক্রবর্তী (১৯০৫-১৯৮০) , গজেন্দ্র মিত্র (১৯০৮-১৯৯৪) প্রমুখের একাধিক গল্পে শ্রীরামকৃষ্ণের ছায়াপাত লক্ষ করা যায়।

সরলাবালা সরকারের (১৮৭৫-১৯৬১) গল্পে বিভিন্নভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভাবাদর্শ ধরা পড়ে। এর প্রধান কারণ তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাদর্শের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন। ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর সখ্যতা ছিল। তাঁর কথায় :

> "আর দেখেছি নিবেদিতাকে। খুব ভালো করে দেখেছি। দেখে মোহিত হয়েছি, মুগ্ধ হয়েছি। মনে পড়ে বাগবাজারে পূজামণ্ডপে তিনি এলেন—খালি পা। এই দৃঢ়ব্রতা সন্ন্যাসিনীর নিষ্ঠা ঐকান্তিকতা সদাচার দেখে জীবনে বিমল আনন্দ লাভ করেছি। শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়েছে। এক বিদেশিনি আমাদের যে শিক্ষা দিয়ে গেছেন, তা যদি আমরা প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করতে পারতাম, তাহলে আমাদের দেশের চেহারাই বদলে যেত। জীবনে যদি কাউকে শ্রদ্ধা করতে না পারি, তাহলে লোকের শ্রদ্ধা পাব কি করে? নিবেদিতার জীবনটাই ছিল শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ, তাই তিনি সকলের শ্রদ্ধেয়া।"[২২]

স্বাভাবিকভাবেই সাহিত্যে তার ছায়া পড়ে। নিবেদিতার জীবনী রচনা ও শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের ইতিহাস রচনা সরলাবালা দেবীর অনবদ্য কৃতিত্ব। তবে 'গল্প-সংগ্রহ' গ্রন্থের 'সন্ন্যাসীর স্ত্রী' (১৩৪৭ বঙ্গাব্দ) গল্পে শ্রীরামকৃষ্ণদেব এসেছেন ভাবময় হয়ে।

গল্পে স্বামী অচ্যুতানন্দের চরিত্র শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাদর্শের সঙ্গে মেলে। গল্পের মূল বিষয় সন্ন্যাসীর পত্নীপ্রেম। অচ্যুতানন্দ স্বামীর ত্যাগ, সাধনা সকলের কাছে জনপ্রিয়তা পায়। গল্পে আছে :

> "তিনি সেবাশ্রমের কার্যভার এবং ব্রহ্মচারী ও তরুণ সন্ন্যাসীদিগের বেদান্ত অধ্যাপনার ভার লইয়াছে।" (পৃ. ২৬৮)[২৩]

গল্পের বিষয়বস্তুতে আর সেভাবে শ্রীরামকৃষ্ণকে পাওয়া না গেলেও গল্পের ভাবটি যথাযথ সংরক্ষিত হয়েছে। গল্পটি সার্থক ছোটগল্প হিসেবে পরিগণিত হয় তার ব্যঞ্জনাময় প্রকাশ দেখে। যে স্ত্রীকে অচ্যুতানন্দ প্রথম পর্যায়ে ত্যাগ করেছিল, শত বিপত্তি সত্ত্বেও নিজেকে সংযত রেখে সন্ন্যাসী জীবনযাপন করেছিল, সেই স্ত্রীর অসুস্থতার সময় স্বামী অচ্যুতানন্দ কাছে গিয়ে কানের কাছে স্ত্রী-কে পরিচিত নামে ডেকে ওঠেন। গল্পের ব্যঞ্জনাটি এখানেই নিহিত।

গল্পটির আবেদন সর্বজনগ্রাহ্য। সন্ন্যাসী হয়েও গৃহীর বেশে অচ্যুতানন্দ স্ত্রী রেবতীর কাছে গেছেন এবং তাঁকে 'রেবা' সম্বোধনে ডেকে ওঠেন। ঘটনাপরম্পরায় রোগিণীর জ্ঞান ফেরে :

> "চমকিয়া সন্ন্যাসীর মুখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিল। সে দৃষ্টিতে কি ছিল কে জানে ! একহাতে স্বামীর হাত জড়াইয়া ধরিল, সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিল নিশ্চিন্ত আরামে।"[২৪]

এদিকে স্বামীর প্রতি তাঁর একান্ত ভালোবাসা, অন্যদিকে শ্রদ্ধা। সন্ন্যাসী তাঁর স্বামী, একথা নিশ্চিত হলেও সন্ন্যাসীরা গার্হস্থ্য জীবনে দ্বিতীয়বার প্রবেশ করে না। কিন্তু সন্ন্যাসীরা কঠোর নয়, তাঁদের হৃদয়ও অফুরন্ত ভালোবাসায় পূর্ণ হয়—যে ভালোবাসা গুটিকয়েক চরিত্রের জন্য নয়, বরং সমগ্র বিশ্বের জন্য পরিব্যাপ্ত হয়ে প্রকাশ পায়। রেবতী তাই সেই বিশ্বপ্রেমের প্রতিভূ সন্ন্যাসীর হাত জড়িয়ে নিশ্চিন্তে চিরবিশ্রামে চলে যেতে পেরেছে। গল্পকার শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাদর্শের অন্যরূপ স্বামী বিবেকানন্দের সন্ন্যাসকে গুরুত্ব দিয়ে বিশ্বপ্রেমের বাণীকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁর গল্পে। অসাধারণ শিল্প মহিমায় ও ব্যঞ্জনায় গল্পটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে রাজশেখর বসুর (১৮৮০-১৯৬০) অবদান উল্লেখযোগ্য। ছোটগল্পের ইতিহাসে ব্যঙ্গময় আবহ তৈরিতে তিনি সিদ্ধহস্ত। আর তারই মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলেন সমাজের বাস্তব দিকগুলি। সেই রাজশেখর বসুর একটি গল্পে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রভাব লক্ষ করা যায়। গল্পের নাম 'নিধিরামের নির্বন্ধ' (১৩৬২ বঙ্গাব্দ)। গল্পটিতে নিধিরাম সরকার একজন দেশপ্রেমিক এবং সংশয়াপন্ন ব্যক্তি। মৃত্যুর পর তিনি পরলোক গমন করেন। সেখানে বিধাতার সঙ্গে তাঁর কথোপকথনে ফুটে ওঠে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ ও ভাবাদর্শ। নিধিরাম বিধাতার কাছে অনুরোধ করেন :

> "মানুষ ভালো না হলে দেশের ভাল হবে না। আপনি দেশের অন্তত সিকি লোককে ভাল করে দিন, তারাই বাকী সবাইকে শোধরাতে পারবে।"[২৫]

এইপ্রসঙ্গে বিধাতা বলেন : "আচ্ছা, চৈতন্য মহাপ্রভু আর রামকৃষ্ণ পরমহংসকে ভাল লোক মনে কর তো?"[২৬] নিধিরাম কপালে হাত তুলে প্রণাম জানিয়ে উত্তর দেন : "ওঁরা অবতার কি না জানি না, তবে মহাপুরুষ তাতে সন্দেহ নেই।"[২৭] বলাবাহুল্য, নিধিরাম শ্রীরামকৃষ্ণকে মানতেন সমাজে আড় পাঁচজনের মতোই। এরপর যখন বিধাতা জানান : "যদি ন কোটি ভারতবাসী শ্রীচৈতন্য বা শ্রীরামকৃষ্ণের তুল্য হয়ে যায় তাহলে তোমার মনস্কাম পূর্ণ হবে তো?"[২৮], এর উত্তরে নিধিরাম বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ, চৈতন্য আর দরকার নেই, এবার প্রয়োজন একদল কর্মী, বুদ্ধিমান, জনহিতৈষী, সংসারী সৎ পুরুষের। বিচক্ষণ নিধিরাম জানতেন অবতার বা মহাপুরুষের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে—তাঁদের যা দেওয়ার সংসার ও সমাজকে তা তাঁরা দিয়ে গেছেন, এখন প্রয়োজন

তাঁদের আদর্শে একদল কর্মী যুবকের যারা মানুষের পাশে মানুষের সেবায় সদা প্রহরী হয়ে থাকবে।

গল্পের শেষে দেখা যায় বিধাতা ও নিধিরামের কথোপকথনে যখন সকল প্রার্থনাকে তুচ্ছ করে দিচ্ছেন বিধাতা, তখন বিধাতা নিজেই জগতের উন্নতির জন্য পথ বলে দিলেন :

> "তুমি যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রো তাতেই তোমার জন্ম সার্থক হবে। একবারে কিছু করতে না পারলে বারবার অবতরণ ক'রো। যদি অনন্তকালেও কিছু করতে না পার তা হলেও বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষতি হবে না।"[২৯]

এখানেই সকল যুক্তি ও তত্ত্বের সমাধান হল, গল্পের অন্তঃসলিলা দ্বন্দ্বময় ব্যঞ্জনাটিও প্রকাশিত হল।

পরবর্তী গল্পকার জ্যোতির্ময়ী দেবী (১৮৯৪-১৯৮৮)। বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে তাঁর বিশিষ্ট অবদান রয়েছে। তাঁর প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় 'বিজলী' পত্রিকায় ১৩২৭ বঙ্গাব্দে। শ্রেষ্ঠ গল্পসংকলন 'সোনা রূপা নয়'। এই গল্পসংকলনের জন্য তিনি ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে রবীন্দ্র পুরস্কার পান। অন্যান্য গল্পের বই হল- 'রাজযোটক', 'আরাবল্লীর আড়ালে' (১৯৫৫), 'ব্যান্ড মাষ্টারের মা' (১৯৬১), 'আরাবল্লীর কাহিনী' (১৯৬৫) ইত্যাদি। বিখ্যাত উপন্যাস হল 'ছায়াপথ' (১৯৩৫), 'বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ' (১৯৪৮) , 'মনের অগোচরে' (১৯৫২), 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' (১৯৬৮) ইত্যাদি। প্রথম উপন্যাস 'ছায়াপথ' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় লীলা রায় সম্পাদিত 'জয়শ্রী' পত্রিকায়।

তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাদর্শের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন। তাঁর রচনায় পাওয়া যায় :

> "১৩০৫, ইংরেজি ১৮৯৮। পাক্ষিক উদ্বোধন এল রাজপুতানায় জয়পুরের বাড়ীতে। আমার তখন বয়স পাঁচ-ছয়। হাতে খড়ির পর প্রথম ভাগ শেষ করেছি বোধহয়। পিতামহীর ঘরে শুধু গল্প শুনি রামায়ণ মহাভারতের আর তাঁর ঘরের বাইরে বইয়ের স্তূপ ঘাঁটি। সন্ধান পেলাম কথামৃতের গল্পের। উদ্বোধনের পাতায়-পাতায় কথামৃতের গল্প অসংখ্য।... ... দুপুরবেলায় ঘোড়ার গাড়ি করে গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে শ্রীম-র পুণ্য ভবনে গেলাম, বেলা দুটো হবে। শ্রীম তখন বিশ্রাম করছেন শুনলাম। আর দিদিমা তাঁর পুত্রবধূকে নিয়ে কোথায় যাবেন তখনই। ... পরদিন সকালে দিদিমার কাছে কে একজন এসে শ্রীম-র হস্তাক্ষরে আমার নাম লেখা আশীর্বাদস্বরূপ বই—কথামৃত প্রথম খণ্ড দিয়ে গেলেন।"[৩০]

'সোনা রূপা নয়' গল্পসংকলনের একটি গল্প 'অজাত' (১৩৬৯ বঙ্গাব্দ)। গল্পটি শুরু হয়েছে গল্পের নায়িকা সতীর দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে যাওয়ার ঘটনা দিয়ে। ভোরবেলার দুঃস্বপ্ন। সতী ভয় পায়। দুটো সন্তানের জননী সে। তৃতীয় সন্তান আর চায় নি সতী। তবু গর্ভবতী হয়েছে। স্বামী বলেছিল নষ্ট করে দিতে। ডাক্তার সায় দিয়ে বলেন, ওতে দোষ নেই। সতীর মনে উৎকট ভয় এসে বাসা বাঁধে। একটা প্রাণবিন্দুকে কত যত্নে সে লালন পালন করে। তাকে দেখেনি অথচ কত মায়া মমতা জন্ম নেয়। এই যন্ত্রণার কথা সতী কাউকে বলতে পারেনা। তাঁর মনে হয়, বললে হয়তো ছেলের ক্ষতি হবে। সর্বক্ষণ সে স্বপ্ন দেখে—দুঃস্বপ্ন, অজাত শিশুর দুঃস্বপ্ন। তাই সে একটু আশ্রয় পেতে চায় শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে :

> "এখনকার সংসার, ঠাকুর ঘর-টর নেই কিছু। কিন্তু ক্যালেণ্ডারে তো ছবি আছে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের, মা দুর্গার—সেখানে লুটিয়ে পড়ে সে কেঁদে ফেলল।"[৩১]

বস্তুত সতীর জীবনে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব সতীকে কুড়ে কুড়ে খায়। নিজের স্বামীকেও তা বলতে পারেনা। ফলে তাঁর শরীর অসুস্থ হতে শুরু করে এবং দিন দিন তা চরম মাত্রায় পৌঁছায়। গল্পের চূড়ান্ত মুহূর্তটি দেখা যায় গল্পের একেবারে শেষ প্রহরে—যখন অসুস্থ সতী আর কারো ডাকে ওঠে না। লেখিকা জানিয়েছেন :

> "ছেলেমেয়েরা 'মা জাগো' বলে কাছে এসে জাগাতে লাগল। কিন্তু সে খুব ঘুমিয়েছে। অনেকদিন অনেক বিনিদ্র রাত্রির পর। এবারে কোনোদিন আর স্বপ্ন দেখবে না।" (পৃ. ২১২)[৩২]

বলাবাহুল্য এভাবেই অসাধারণ ব্যঞ্জনায় গল্পটি সার্থকতা লাভ করেছে।

বাংলা কথাসাহিত্যের জনপ্রিয় তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০)। বাংলা কথাসাহিত্যে তাঁর অবাধ বিচরণ। বিশেষত একটি শান্ত-সৌম্য প্রেক্ষাপটে জীবনের গভীরতায় জীবনকে খুঁজতে গিয়ে লেখক বারেবারে জীবনের সত্তায় পৌঁছে গেছেন। কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। প্রায় একই প্রেক্ষাপটে লেখা একটি গল্প 'কুশলপাহাড়ি'। কুশলপাহাড়ি নামক একটি এলাকায় লেখকের গমন ও অভিজ্ঞতার বিবরণ মেশানো এ গল্পে ব্যস্তময় জীবনে প্রায় লেখাপড়া-না-জানা এক অখ্যাত সাধুর প্রজ্ঞা ও জীবনদর্শনের কথা ব্যক্ত হয়েছে।

সতীশবাবু মনোহরপুর বেড়াতে গেছেন। সামনেই কুশলপাহাড়ীর ভৈরব থান। জনহীন অরণ্যে বিরহোড় জাতির বসবাস। অবশেষে মঙ্গল টুডুকে সঙ্গে নিয়ে সতীশবাবু ও মন্মথবাবু সাধুর সন্ধানে যান। মঙ্গল টুডু জানান, "সাধু খুব বড়। মৌন থাকেন দিনে। রাত্রে কথা বলেন।"[৩৩] লেখক সাধুকে দেখে বিস্মিত হন। মুগ্ধ হন সাধুর মুখে ঈশোপনিষদের একটি শ্লোক ও তার ব্যাখ্যা শুনে :

> "কবিই তিনি বটেন বাবা। এখানে বসে বসে দেখি। এই শাল গাছটাতে ফুল ফোটে, বর্ষাকালে পাহাড়ে ময়ূর ডাকে, ঝর্ণা দিয়ে জল বয়ে যায়, তখন ভাবি কবিই বটে তিনি। আমি কিছু পাইনি বাবা। ভড়ং দেখচো, এ সব বাইরের। ভেতরের জ্ঞান কিছু হয়নি। তবে দেখতে চেয়েচি তাঁকে। তাঁর এই কবিরূপ দেখে ধন্য হয়েছি।"[৩৪]

সাধুর বাড়ি মানভূম হলেও, কিংবা হয়তো শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাদর্শের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না এমন ধরে নিলেও তাঁর কথাবার্তায় সেই ভাব পরিস্ফূট হয়েছে যা শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাদর্শের সঙ্গে মেলে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভেতরের জ্ঞানের কথা বেশি বলেছেন। আর জানিয়াছেন, ঈশ্বরকে দেখা যায়, যেমন অন্য মানুষকে দেখা যায়, তেমনি করেই। ঈশ্বরের কবিরূপ দেখে যেমন কুশলপাহাড়ীর সাধু ধন্য হয়েছেন, সেই কবিরূপের কথাও বর্ণনা করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

সাত বছর পর লেখক যখন শহুরে পরিবেশে শুধুই বৈষয়িক কথাবার্তা শুনে পাগল হয়ে উঠেছেন, তখন মিলিয়েছেন সেই সাধুর পরিবেশের সঙ্গে। মনে করেছেন সাধুর মুখে মুক্তির কথাগুলি :

> "মুক্তির ধারণা বন্ধন আছে বলেই আসে। যথার্থ বিচারের দৃষ্টিতে মানুষের মুক্তিও নেই, বন্ধনও নেই। ব্রহ্ম এক অচিন রাজ্য, যে সেখানে যায়, সেই বোঝে ব্রহ্ম দ্বৈতও নয়, অদ্বৈতও নয়। তিনি শাস্ত্রের পারে, বাদানুবাদেরও পারে ; দ্বৈতবাদের প্রতিপাদ্য নয়, অদ্বৈতবাদেরও প্রাপ্য নয়। অনুভূতি একমাত্র জিনিস। মানুষ মুক্ত আছেই, কেবল সে সম্বন্ধে সচেতন নয় সে। মানুষ সদামুক্ত, সে মানুষ। কিছু পড়তে হবে না। কিছু সাধনা করতে হবে না। অনুভূতিই উত্তরায়ণের সেই অভিযাত্রী, যা তাকে পলকে মুক্তির জ্যোতির্লোকে নিয়ে গিয়ে তুলতে পারে। বিশ্বাস কর বাবা। মানুষ মুক্ত। সে-ই নিজেকে নিজে বেঁধেচে। সে-ই অনুভব করুক সে মুক্ত। সে মানুষ, সে মুক্ত।"[৩৫]

শ্রীরামকৃষ্ণ যেভাবে বলেছেন অনুভূতিতেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায় কিংবা আপন সত্তায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব বর্তমান, সর্বজীবে সেই ব্রহ্ম রয়েছেন—ঠাকুরের মতোই কুশলপাহাড়ীর প্রায় লেখাপড়া না-জানা শুধু সাধু সহজ ভাষায় ঈশ্বরপ্রাপ্তির মূল সূত্রটুকুর সন্ধান দিয়েছেন লেখককে। ব্যক্তিগত

জীবনে লেখক বিভূতিভূষণ শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাদর্শের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে এই ভাব আরও প্রকট হয়েছে এই গল্পে। শহুরের বৈষয়িক জীবনযাত্রার চেয়ে অনেক ভালো এই রমণীয় প্রকৃতির কোলে সাধুর পরিবেশ, যেখানে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দেয়, ঈশ্বরকে উপলব্ধি করায়।

লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় অরণ্যনির্ভর জীবন সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। আর তাই তাঁর সাহিত্যে অরণ্য বারেবারে পরিবেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। কেবল নামেই নয়, তার সুবিস্তৃত বর্ণনায় সম্যক আত্মপ্রকাশ হয়ে থাকে। এই পটভূমিতে লেখা গল্পে কুশলপাহাড়ী নামক একটি এলাকার চিত্র উঠে এসেছে। লেখক জানিয়েছেন :

"সুন্দরগড় অরণ্য-প্রকৃতির লীলা নিকেতন। পথে পথে করম গাছের ফুলের ঝরা-পাপড়ি বিছানো। লম্বা-ঠোঁট ধনেশ পাখী ও বনটিয়া ডালে ডালে বেড়াচ্ছে। ক্বচিৎ কোনো পর্বতচূড়ায় প্রভাতের সোনালী রোদ এলানো, ক্বচিৎ কোনো পার্ব্বত্য ঝর্ণার জলের ধারে লোহাজালি ফুটে ফুটে পাথর ঢেকে ফেলেচে।"[৩৬]

এইরকম একটি পরিবেশে সুপ্রাচীন বিরাট শালগাছের নিচে একটি শিলাখণ্ডের উপর বসে থাকেন মৌন সাধু। অরণ্য প্রকৃতির নিবিড়তায় জীবনের নিবিড় শিক্ষাপ্রাপ্ত সাধু নিশ্চুপ বসে থাকেন এই শিলাখণ্ডের ওপর। লেখক বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যান অরণ্য প্রকৃতি ও মানব প্রকৃতির নিবিড় একাত্মতা ও প্রজ্ঞার বিচ্ছুরণ দেখে। গল্পের মাধুর্য ঠিক এখানেই। তবে শহরের জীবনযাত্রায় যখন আবার লেখককে আসতে হল, তখন আরো বেশি করে অনুভব করেছিলেন এই কবিত্বশক্তিকে, এক হয়ে যাওয়ার ভাবনাকে। আর একত্মবোধ, যা সেই সাধুর মুখে প্রচারিত, তাকেই প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন অতি যত্নে। শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাদর্শের মূল স্রোতটুকু এখানেই নিহিত।

'দাদামশাই' কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি চিঠিতে বনফুলকে লেখেন, "... ছোটগল্পই সাহিত্য জগতে তোমাকে বড় করিবে।"[৩৭] এই বনফুল ওরফে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন রবীন্দ্রোত্তর ছোটগল্পের অন্যতম একজন ও বাংলা পোস্টকার্ড স্টোরি বা ক্ষুদ্রাকৃতি ছোটগল্পের জনক। কম বলে বেশি বলার দক্ষতায় বনফুলের সমকক্ষ বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে কেউ আছেন বলে মনে হয় না। বুদ্ধদেব বসু ঠাট্টা করে এইসব গল্পকে বলেছেন 'চুমুকের গল্প'। বনফুল রচিত গল্পগ্রন্থের সংখ্যা আঠাশ। মাসিক 'প্রবাসী' পত্রিকায় ১৩২৯ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় তাঁর প্রথম গল্প 'চোখ গেল' প্রকাশিত হয়। গুরদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স বনফুলের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'বনফুলের গল্প' প্রকাশ করেন ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে। তাঁর রচিত উপন্যাসের সংখ্যা ষাট।

বনফুলের সংসারে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবনার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। বনফুলের স্ত্রী লীলাবতী ছিলেন মা সারদাদেবীর স্নেহধন্যা। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় জানান, শৈশবে তাঁকে চুল পর্যন্ত আঁচড়ে দিতেন সারদামণি। কটকট করে কথা বলতেন বলে নাম দিয়েছিলেন 'কটকটি'।"[৩৮] সুতরাং স্ত্রীর সূত্র ধরে বনফুলের শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শে অনুপ্রেরণা পাওয়ার একটি শক্তিশালী কারণ ছিল। পরবর্তীকালে তিনি নিজেও শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়ে কবিতা লেখেন। যেমন 'শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চোখ দুটি' কবিতায় বনফুল লিখেছেন : "নিষ্পলক নয়নের নিঃশব্দ বাণী/ নিরন্তর বলে যাচ্ছে—পারবি, পারবি, ঠিক পারবি/ তোকে পারতেই হবে।"[৩৯] কথাসাহিত্যিক বনফুলের কথাসাহিত্যেও স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রসঙ্গ। এরকম একটি গল্প হল 'ফ্রেমে বাঁধানো কার্ডবোর্ড'।

গল্পটি হিরণ সেনের গল্প। চিকিৎসক লেখক তাঁর চিকিৎসা করার সূত্রে দারুণ একটি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। হিরণ সেন চরিত্রটি বেশ অদ্ভুত বলে মনে হয়েছে লেখকের কাছে। ছাত্রজীবনে স্বামী বিবেকানন্দকে আদর্শ মেনেছিলেন ও ব্রহ্মচর্য রক্ষায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। অন্যদিকে তিনি শেফালীকে ভালোবাসেন। কিন্তু ব্রাহ্মণকন্যা শেফালীকে বিয়ে করতে বাধা দেয় শেফালীর বাবা। শেফালীর বিয়ের ঠিক হয় ষাট বছরের এক বুড়োর সঙ্গে। ফলে হিরণ উত্তেজিত হয়ে পড়েন। তিনি কলকাতা থেকে গুণ্ডা ভাড়া করে শেফালীকে তুলে নিয়ে আসেন। এবার শেফালী নিজে ব্রাহ্মণকন্যা হয়ে কায়স্থ হিরণকে বিয়ে করতে চাইল না। বাধা পেয়ে হিরণ উন্মত্ত অবস্থায় জাপটে ধরলেন শেফালীকে। অসহায় শেফালীর আর্তনাদ কেউ শুনতে পেল না।

এরপর হিরণের কথায় :

> "তারপর কি হল জানেন? ঝন ঝন করে একটা শব্দ হল। ঘরের দেওয়ালে স্বামী বিবেকানন্দের যে-ছবিটা টাঙানো ছিল দেখি তার কাচটা চুরমার হয়ে গেছে, আর স্বয়ং স্বামীজী আমার সামনে দাঁড়িয়ে। রাগে থরথর করে কাঁপছেন। বজ্রনির্ঘোষে বললেন, 'পাষণ্ড, এখনই ছেড়ে দাও ওকে।' আমার কোমরে একটা লাথি মারলেন, আমি পড়ে গেলাম ; সেই থেকেই কোমর ভেঙে পড়ে আছি—"[৪০]

হিরণ জানান, এরপর স্বামীজী শেফালীকে নিয়ে বেরিয়ে যান। কিন্তু সবাই জানে, সে গঙ্গার জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। হিরণ জানান, স্বামীজীই শেফালীকে নিয়ে চলে যান, তার অন্য একটি প্রমাণ 'দেয়ালে প্রকাণ্ড একটা ফ্রেমে বাঁধানো কার্ডবোর্ড ঝুলছে, ভেতরে ছবি নেই।' অসহায় যন্ত্রণাকাতর হিরণ অনুশোচনায় দগ্ধ। তিনি চিকিৎসককে অনুরোধ করেন তাঁর জন্য স্বামীজীর

কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করার। লেখক জানান, "হিরণবাবুর ডাক্তারি চিকিৎসা আমি করি নি। তবে তার জন্য রোজ প্রার্থনা করতাম। সেদিন খবর পেলাম তিনি মারা গেছেন।"[৪১]

গল্পের পরিণতিতে এভাবে হিরণ সেনের মৃত্যু সমাজের আত্মযন্ত্রণায় দগ্ধ মানুষের করুণ পরিণতিকে চিত্রিত করে। আদর্শবাদী হিরণ সেন সামান্য মায়ার ভুলে যে ভুল করেছিল তার পরিণতি এতটা করুণ ও ভয়ংকর হবে সেটাই গল্পের অন্যতম একটি দিক। অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হিরণ সেন চরিত্রটি গল্পে সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে।

হাসির গল্পের একজন প্রথিতযশা লেখক শিবরাম চক্রবর্তীর (১৯০৫-১৯৮০) দুটি গল্পে শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন ঘটেছে অন্যমাত্রায়। মজাদার শিবরাম চক্রবর্তীর সরস লেখায় শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ এসেছে বেশ কয়েকবার। তাঁর লেখা অন্যতম গল্প 'দেশের মধ্যে নিরুদ্দেশ'। গল্পটির ভিত্তি শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবনা—যত মত তত পথ বা সর্বধর্মসমন্বয়। অনেক বছর আগে হর্ষবর্ধনের পা ভেঙে যায়। চিকিৎসার জন্য ভর্তি হন রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে। সেখানে পায়ে প্ল্যাস্টার লাগিয়ে বেশ কিছুদিন ছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের নিয় অনুযায়ী সেইসময় রোজ বিকেলে এক স্বামীজী আসতেন রুগীদের ধর্মশিক্ষা দিতে। স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব প্রচার করতেন। হর্ষবর্ধনও সেসব শুনতেন। তবে তাঁর সবথেকে বেশি ভালো লাগে শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্মসমন্বয় সংক্রান্ত ভাব। সেকারণেই সেবাশ্রম থেকে ফিরে আসার পর তাঁর মনে শুধু এই ভাবনাই ঘুরপাক খায়। এমনকী, তাকে বাস্তবায়িত করতে যারপরনাই সচেষ্ট হন। কিন্তু কোনো সুরাহা মেলে না।

টাকার চিন্তা নেই। অথচ সব ধর্মকে এক জায়গায় কীভাবে আনা যায় তার কোনো সমাধান পান না হর্ষবর্ধন। অবশেষে বাজারের মধ্যিখানে পায়খানা তৈরি ও এক পাইস হোটেল তৈরি করে তিনি সব ধর্মের মিলনক্ষেত্র তৈরি করতে সক্ষম হন। হারুর কথায় :

> "এই জায়গাতেই তুমি সব ধার্মিকের মিল পাবে ভাই। আহার করা আর বাহার করা—তাইতেই। সর্বধর্মসমন্বয় এইখানেই। ধর্ম আর কর্ম—দুইয়ের সমন্বয় এখানে।"[৪২]

গল্পটির শেষ অংশ এভাবে সর্বধর্মসমন্বয়ের মতো ভাবকে সরলীকরণ করে পায়খানা আর হোটেলে পৌঁছে দিলেন শিবরাম চক্রবর্তী তা ভাবনায় বৈপরীত্য তৈরি করে। আসলে রসিক শিবরাম সমাজের সাধারণ মানুষের বুদ্ধি ও বোঝার দৌড়কে সূচিত করে হর্ষবর্ধনের মধ্য দিয়ে তা তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ অনুরাগী অনেক ভক্ত হর্ষবর্ধনের মতোই শ্রীরামকৃষ্ণ

ভাবাদর্শ বুঝতে ও তা প্রয়োগ করতে অক্ষম। সেদিক থেকে হাসির গল্প হিসেবে গল্পটি উৎকৃষ্ট। আবার সমাজের প্রতি তীক্ষ্ম ব্যঙ্গ তুলে ধরতেও সক্ষম।

শিবরাম চক্রবর্তীর অপর একটি গল্প 'ধাপে ধাপে শিক্ষালাভ'। এই গল্পটির ভিত্তি শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব 'যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি'। গল্পের প্রথমেই গল্পকার তাই জানিয়েছেন :

> "শিক্ষালাভের কোন বয়েস নেই সে কথা সত্যি। যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি, পরমহংসদেবের সার কথা। আর যত শিখি ততই দৃষ্টান্ত—চোখে পড়ে, আর যত দেখি ততই শিখি—ততই আরো শিক্ষা হয়।"[৪৩]

এই গল্পটিও হর্ষবর্ধনের পা ভাঙা দিয়ে শুরু। রোয়াকের তিনটে ধাপে যেতে গিয়ে পা ফসকে পড়ে যান। ফলে ভর্তি হন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে। সেখানের নিয়ন অনুযায়ী এক সন্ন্যাসী আসতেন রুগীদের ধর্মশিক্ষা দিতে। হর্ষবর্ধনও সেই শিক্ষা পেয়েছেন। কিন্তু এই সামান্য ক'দিনে তাঁর মনে হয়েছে সে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়নি। তাই পা জুড়ে গেলেও তিনি সেই ধর্মশিক্ষা সম্পূর্ণ করতে চান। বলাবাহুল্য, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের চরণতলে স্থান পাওয়ার জন্য চিন্তিত হয়ে ওঠেন। অবশ্য লেখক হর্ষবর্ধনকে জানান :

> "তবে তাঁর দুটি মাত্র পা ছিল এই জানি। সেই দুটি তো বিবেকানন্দ আর শ্রীশ্রীমা দখল করে বসে আছেন, যেমন এখানে তেমনি সেখানেও। তাঁর পার্ষদবর্গের আর কেউ পেয়েছেন বলে মনে হয়না। তবে অচিন্ত্যনীয় উপায়ে কেউ যদি পায়ে ঠাঁই পেয়ে থাকে বলা যায় না।"[৪৪]

অবশেষে অসম্পূর্ণ শিক্ষা সম্পূর্ণ করার উপায় বেরোয়। লেখক বলেন, বাকি অর্ধেক শিক্ষা লাভ করার জন্য পুনরায় একইভাবে সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে পা ভাঙাতে হবে। তাহলে আবার রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে থাকার স্থান পাওয়া যাবে এবং অর্ধেক ধর্মশিক্ষা হয়ে যাবে। এখানেই গল্পের চূড়ান্ত পরিণতি। আবার গল্পের একেবারে শেষ পর্যায়ে দেখা যায় হর্ষবর্ধন এই উপায় শুনে সংশয়চিত্তে বলেছেন, "ধাপে ধাপে?" গল্পকার উত্তর দিয়েছেন, "ধর্মকে ধাপপা বলে না দাদা? এইজন্যেই তো?"[৪৫]

বাস্তব জীবনের অনুকরণে সৃষ্ট হর্ষবর্ধন ও তাঁর ভাবনা নিতান্তই রসময় হলেও অন্ধ ভক্তদের বুদ্ধিহীনতাকে প্রকাশ করে এই গল্প। সেদিক থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাদর্শকে অস্বীকার করেও লেখক স্বীকৃতি দিয়েছেন সমাজে তাঁর বহুল প্রভাবকে। গল্পটিও যথেষ্ট ব্যঙ্গময় ও সার্থক।

অপর এক শক্তিশালী লেখক গজেন্দ্রকুমার মিত্র (১৯০৮-১৯৯৪)। তিনি পঞ্চাশের বেশি উপন্যাস ও শতাধিক ছোটগল্প রচনা করেন। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'পাঞ্চজন্য', 'পৌষ ফাগুনের পালা' ইত্যাদি। উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প সংকলন হল—'স্বর্ণমৃগ', 'কথা কল্পনা কাহিনী' ইত্যাদি।

গজেন্দ্র মিত্র রামকৃষ্ণ মিশনে যেতেন। এমনকী, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বিষয়ে তাঁর বেশ কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে 'উদ্বোধন' পত্রিকায়। 'প্রাণের ঠাকুর' প্রবন্ধে লিখেছেন :

> "ওঁর কথা পড়লে বা শুনলে মনে হয়—সেই ঈশ্বর, যিনি আমাদের কাছে ভয়ের পর্দায় অজানা আতঙ্কের আবরণে আবৃত তিনি একেবারে পাশে এসে বসেছেন, পরম স্নেহে পিঠে হাত বুলিয়ে আশ্বাস দিচ্ছেন, বলছেন : "আমি তো আছিই তোর কাছে, থাকবও। এমনি চিরদিনই থাকি। লোকে আমাকে ঠেলে সরিয়ে দেয় তাদেও পণ্ডিতি দিয়ে। নইলে আমি সকলেরই কাছের মানুষ, খুবই কাছের।' রামকৃষ্ণ ভবপারের কান্ডারি কি না জানি না—ইহলোকের ভয়ত্রাতা, পিতা, বন্ধু, প্রিয়, প্রিয়তম। এইটুকু জানি, এই বিশ্বাসেই নিশ্চিন্ত আছি।"[৪৬]

সুতরাং বোঝা যায়, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাদর্শের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন। তাই খুব সহজেই তাঁর সাহিত্যে শ্রীরামকৃষ্ণ এসে পড়েছে।

গজেন্দ্র মিত্রের 'আত্মহনন' গল্পে তাই শেষপর্যন্ত সম্পত্তি সমর্পণের একমাত্র সঠিক জায়গা হিসেবে ভাবা হয়েছে রামকৃষ্ণকে।

বর্তমান সময়ের একজন দক্ষ কথাশিল্পী শেখর বসু (১৯৪০—)। পেশায় সাংবাদিক শেখর বসু নতুন ঘরানার গল্প লেখার আঙ্গিক দেখিয়েছেন। তাঁর মতে, বর্তমানের গল্প হবে শুধু নির্মাণ। এই গল্পের কোনো পূর্বনির্দিষ্ট চেহারা বা চেহারার আভাস নেই। গল্প এগোতে এগোতে নিজেই নিজেকে আবিষ্কার করবে। শেখর বসুর উল্লেখযোগ্য গল্প সংকলনগুলি হল— 'দশটি গল্প' (১৯৬৯), 'মাঝখান থেকে'(১৯৮১), 'গোয়েন্দার চোখ', 'চোর এসে বই পড়েছিল'(১৯৮৫), 'পরম্পরা', 'ভালোবাসা', 'স্ব-নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প' (১৯৯৮), 'বক্সারের হনুমান'(২০০৩) ইত্যাদি। উপন্যাস সাহিত্যেও তাঁর উজ্জ্বলময় প্রতিষ্ঠা লক্ষণীয়। তাঁর রচিত একটি গল্প 'মধ্যিখানে বেপাড়া' প্রকাশিত হয় আনন্দবাজার পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যা ১৩৮৯-তে। গল্পটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শ ও দক্ষিণেশ্বর প্রসঙ্গ চিত্রিত হয়েছে।

এক দম্পতি বাড়ি ভাড়া নেয় বারবনিতার একটি পাড়ায়। প্রথমে বুঝতে না পারলেও পরে দম্পতি বুঝতে পারে রাস্তায় সেজেগুজে বারবনিতাদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। আকদিন নায়ক বিভাসকে রাত্রে বাড়ি ফেরার সময় পুলিশের হাতে লাঞ্ছনার শিকারও হতে হয়। তাই দুশ্চিন্তাগ্রস্থ বিভাস সেই পাড়া ত্যাগ করে অন্য বাড়ি ভাড়া নিতে চেষ্টা চালায়। এরই মধ্যে একদিন স্বামী-স্ত্রী মিলে দক্ষিণেশ্বরে পুজো দিতে গেলে দেখতে পায় সেই পতিতালয়ের একটি মেয়েকে পূজারিণীরূপে। এইরকম একটি পবিত্র স্থানে বারবনিতাকে দেখে বিতৃষ্ণায় বিভাস স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়ে যায়। বিভাসের স্ত্রী পারমিতা অবশ্য মেয়েটির প্রতি স্নেহ আরোপ করে। বিভাস এতে আরো উত্তেজিত হয়ে ওঠে। রাত্রে নায়ক পারমিতার পাশে শুয়ে মানসিক যন্ত্রণায় ছটফট করে। গল্পকার জানান,

> "বিভাস বুঝতে পারছিল না, সেই গঙ্গা এবং পঞ্চবটীর স্নিগ্ধতা পারমিতার স্পর্শে এখনো আছে কিনা, তবে ঠাকুরের একটা কথা ওর মনে পড়ে গেল হঠাৎই। ঠাকুর বলেছেন, নিরাকার সাকার সবই মানতে হয়। কালিঘরে ধ্যান করতে করতে দেখলাম রমণী বেশ্যা। বললাম, মা তুই এইরূপেও আছিস? তাই বলছি, সব মানতে হয়। তিনি কখন যে কি রূপে দেখা দেন, সামনে আসেন বলা যায় না।" ... ওদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বিচিত্র এক অনুভূতি হল ওর। এই মুহূর্তে ওর সত্যমিথ্যার বোধ কেমন যেন গুলিয়ে গেল। থানা পুলিশ আর ভয়ংকর এক অভিজ্ঞতার সঙ্গে বারবার জড়িয়ে যাচ্ছিল স্নিগ্ধ গঙ্গার তীর আর পঞ্চবটীর স্মৃতি।"[৪৭]

গল্পটি নিতান্তই মনস্তাত্ত্বিকমূলক রচনা। সভ্যসমাজের প্রতিনিধি বিভাস কোনোমতেই বারবনিতার পবিত্রতাকে মানতে পারেনি। এর কারণ তাদের সামজিক স্থান ও জঘন্য পেশা। তাই স্ত্রীর মনোভাবের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ জানিয়েছে বিভাস। কিন্তু সে জানে না শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিভঙ্গির কথা, যেখানে সকলেই সেই মায়ের বা পবিত্রতার খণ্ড বিশেষ—সকলেই সমান—মানুষ, এই ধারণায় পুষ্ট নয় বিভাস। স্বাভাবিকভাবেই গল্পকার নিজেও গল্পের শেষে শ্রীরামকৃষ্ণের কথাকে তুলে এনেছেন। প্রতিষ্ঠা করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবকে।

গল্পে বিভাস চরিত্রটির অন্তর্দ্বন্দ্ব লক্ষ করা যায়। এই দ্বন্দ্ব কেবল বিভাসের নয়—তথাকথিত সকল সভ্য মানুষের যারা সভ্য হয়েও মননে ও ভাবনায় অনেক ক্ষুদ্র। ফলে এই দ্বন্দ্বের তাড়নায় গল্পের প্রবহমানতা, অন্যদিকে স্ত্রীর সঙ্গে মননের বিরোধ গল্পটিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে।

আধুনিকতম লেখকদের একজন শিবতোষ ঘোষ (১৯৫০—) প্রধানত গল্পকার। তবে তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত উপন্যাস হলো— 'খেলনাপাতি'(১৯৮৬) , 'ভূমিদাস', রক্ষিতাপুর', 'সহস্রাব্দের মা' (২০০১) ইত্যাদি।

১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর 'যুগাবতার ভবতারণ' গল্পটি লেখা। গল্পের প্রথম খণ্ডে ভবতারণ ভালো হওয়ার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী অনুসরণ করেন। গল্পে আছে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ। তাঁর কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করার কথা উঠে এসেছে এই গল্পে। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণকে যুগাবতার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

বলাবাহুল্য, শেখর বসু ও শিবতোষ ঘোষের গল্পে শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মীয় জগতের পুরোধা ব্যক্তিত্ব। তবে এখানে তাঁর পরিচিতি শেষ নয়, মানবতাবাদের শেষ কথা যিনি বলেন সেই মহাপুরুষের ব্যক্তিত্ব সমাজে স্বীকৃত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর বাণী অনুসরণ করে চলাই জীবনের মোক্ষম বলে গৃহীত হয়েছে বর্তমান সমাজে। তাই সমাজের সকল স্তরের মানুষ একদিকে যেমন তাঁকে গ্রহণ করেছেন জীবনাচরণে, তেমনি অনেকের কাছে অজানাও থেকে গেছে তাঁর বাণী।

তবে ছোটগল্পের ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে নিয়ে লেখালেখি সচরাচর দেখা না গেলেও গল্পের ভাবপ্রবাহে শ্রীরামকৃষ্ণ এসে যায় বিভিন্নভাবে। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে তাঁর জনপ্রিয়তা ও প্রচার অনেক বেশি। অবশ্য সেখানে যেমন একদিকে ধর্মীয় জগতের ব্যক্তিত্ব হয়ে পূজা পান অন্ধ ভক্তমণ্ডলীর কাছ থেকে, তেমনি রক্তমাংসের মানুষ হয়ে সাহিত্য জগতের প্রধান চরিত্রে হাজির হয়েছেন। তবে সরাসরি বাংলা ছোটগল্পে তাঁর আগমন সহজ নয়, যত না এসেছে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শ। স্বাভাবিকভাবেই সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত্র চিত্রণ প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেনি কিংবা প্রয়োজন হয়ে পড়েনি। সেখানে তাঁর ভাবাদর্শ বা বাণীই প্রধান। ছোটগল্পের বিষয়-আশয়ের ক্ষেত্রেও কোনোরূপ প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়নি। সেক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণদেবও যেমন সহজ হয়ে ধরা পড়েছেন বাণীরূপের মধ্য দিয়ে, তেমনি গল্পে ভাবসত্যটুকুও অক্ষুণ্ণ থেকেছে। সমকালীন সমাজে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবটিও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তবে সাধারণের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের গ্রহণযোগ্যতা সংরূপে যেমন, বিরূপেও তেমন গুরুত্ব পেয়েছে। অন্যদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত্র বা পরোক্ষে তাঁর প্রভাবে ছোটগল্পের মূল স্রোত কোনোভাবেই ক্ষুণ্ণ হয়নি, বরং নিত্য নতুন সংগঠন ও ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে কথাসাহিত্যের দরবারে।

সূত্র নির্দেশ

১. ছোটগল্পের কথা, ভূদেব চৌধুরী , পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৪, পৃ. ২৭

২. সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, 'ষড়রত্ন', করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১লা বৈশাখ ১৪২২, পৃ. ৮৩

৩. ঐ, পৃ. ৮৫

৪. ঐ, পৃ. ৯৩

৫. সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, 'মহামানবের সাগরতীরে', করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা বইমেলা ২০১২, পৃ. ৬১-৬২

৬. ঐ, পৃ. ৬৩

৭. ঐ, পৃ. ৯৪

৮. ঐ, পৃ. ৯৫

৯. সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, 'শ্রীরামকৃষ্ণ মেল', মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮, পৃ. ১

১০. ঐ, পৃ. ১২

১১. ঐ, পৃ. ১২

১২. ঐ, পৃ. ৩৫

১৩. ঐ, পৃ. ৪৩-৪৪

১৪. ঐ, পৃ. ৪৭

১৫. ঐ, পৃ. ৫৯

১৬. ঐ, পৃ. ৫৮

১৭. ঐ, পৃ. ৪৮

১৮. ঐ, পৃ. ৭৮

১৯. ঐ, পৃ. ৭৯

২০. সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, ‘জগৎচন্দ্র হার’, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, মাঘ ১৪০৮, পৃ. ৬১

২১. ঐ, পৃ. ৭১

২২. সুশীল রায় ‘মনীষী-জীবনকথা, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, অক্টোবর ১৯৬০, পৃ. ৮০

২৩. শ্রীসরলাবালা সরকার, ‘গল্পসংগ্রহ’, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, সংস্করণ ১৯৫৭, পৃ. ২৬৮

২৪. ঐ, পৃ. ২৭৩

২৫. রাজশেখর বসু, ‘পরশুরাম গল্পসমগ্র’, এম. মল্লিক পাবলিশার্স, কলকাতা, তৃতীয় প্রকাশ, এপ্রিল ২০০৭, পৃ. ৫৮৩

২৬. ঐ, পৃ. ৫৮৩

২৭. ঐ, পৃ. ৫৮৩

২৮. ঐ, পৃ. ৫৮৩

২৯. ঐ, পৃ. ৫৮৫

৩০. বিমলকুমার ঘোষ প্রকাশিত ‘শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর কথামৃত’, জ্যোতির্ময়ী দেবী (প্রাবন্ধিক), ‘কথামৃত ও কথামৃতকার’ (প্রবন্ধ), রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম, হাওড়া, ১৯৮৩, পৃ. ১২২

৩১. জ্যোতির্ময়ী দেবী, ‘সোনা রূপা নয়’, ন্যাশনাল পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৬৯, পৃ. ২১০

৩২. ঐ, পৃ. ২১২

৩৩. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প’, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, দশম মুদ্রণ, আষাঢ় ১৩৭১, পৃ. ১৮৮

৩৪. ঐ, পৃ. ১৮৯

৩৫. ঐ, পৃ. ১৯০

৩৬. ঐ, পৃ. ১৮৫

৩৭. বনফুল, ‘পশ্চাৎপট’, গ্রন্থালয়, কলকাতা, তৃতীয় প্রকাশ, ১ মার্চ, ২০০০, পৃ. ১১

৩৮. আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮ মার্চ ২০১৭

৩৯. রমেন্দ্রনাথ মল্লিক সংকলিত, ‘ভাবসমাহিত শ্রীরামকৃষ্ণ’, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, চতুর্থ পুনর্মুদ্রণ, পৌষ ১৪২২, পৃ. ২৬৭

৪০. শ্রীভূদেব চৌধুরী, ‘কথার ফের’, ‘দেশ-কাল-শিল্পী’ (প্রবন্ধ), দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪০১, পৃ. ১৯

৪১. ঐ, পৃ. ২০

৪২. শিবরাম চক্রবর্তী, ‘শিব্রাম অমনিবাস’ (১৮শ খণ্ড), নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৮০

৪৩. ঐ, পৃ. ৯৭

৪৪. ঐ, পৃ. ১০০

৪৫. ঐ, পৃ. ১০১

৪৬. রমেন্দ্রনাথ মল্লিক সংকলিত, ‘ভাবসমাহিত শ্রীরামকৃষ্ণ’, গজেন্দ্র কুমার মিত্র (প্রাবন্ধিক), ‘প্রাণের ঠাকুর’ (প্রবন্ধ), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, চতুর্থ পুনর্মুদ্রণ, পৌষ ১৪২২, পৃ. ৪৩১

৪৭. শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৮৯, পৃ. ৮০